

# কলবুন সালীম

নির্মল অন্তর, নির্মল জীবন

মহিউদ্দিন রূপম

সন্দেশ

প্রকাশন লিমিটেড

# সূচিপত্র

প্রারম্ভিক কথা ----- ৬	
সাফল্যের এপিঠ-ওপিঠ ----- ১০	
সংশয়মুক্ত ঈমান ----- ২১	
শুদ্ধ জীবন শুদ্ধ মনন ----- ৩৭	
ক্যালেন্ডারের পাতায় ২১১৯ সাল --- ৪১	
রহমানের পরিচয় ----- ৪৩	
ইবাদুর রহমান যারা ----- ৫৫	
নির্মল অন্তর ----- ৬৪	একটি দু'আর গল্প ----- ১১৬
যে পথ জান্নাতে গিয়ে মিশেছে ----- ৬৬	মুমিনের সামাজিকতা ----- ১২৪
হারাম দরজা ----- ৭৮	আমি সবাইকে মাফ করে দিয়েছি -- ১৩৭
টুকরির বিনিময় প্রাসাদ ----- ৮০	খুশু : সবচেয়ে কঠিন যে ইবাদাত -- ১৪৯
কুরআনের সাথে পথচলা ----- ৮২	নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা ----- ১৬০
আল্লাহর সাথে কথা বলতে ----- ৯৭	নিশিরাতে আল্লাহর সাথে ----- ১৬৩
আমলের স্বাদ হারিয়ে গেলে ----- ১০০	মুমিনের জীবনে অবসর ----- ১৭৫
দু'আ : মুমিনের প্রাণ ----- ১০২	মৃত্যুর দোরগোড়ায় ----- ১৮৪
সব রোগের কার্যকরী ঔষধ ----- ১১৩	প্রকৃত স্বস্তি তাঁরই সান্নিধ্যে ----- ১৮৮

## স্মারিত্তিক কথা

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد  
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السموات  
والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله إلى  
الناس كافة بشيرا ونذيرا، وداعيا

সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে বর্তমান সুস্থতা নিয়ে মানুষের ধোঁকা খাওয়া। সে আশা করে আগামীতেও বুঝি এভাবে সুস্থ সবল থাকবে। আর এই আশায় শেষ বলে কিছু নেই, নেই কোনো সীমা পরিসীমা। প্রভাতে কিংবা সন্ধ্যা গড়াতেই ব্যক্তি এই আশা পোষণ করে। এভাবে প্রতারণার সময় যেতে থাকে, আশার ফিরিস্তিও হয় দীর্ঘ।

শিক্ষা হিসেবে তো এতটুকুই যথেষ্ট ছিল, আপনি আপনার সমবয়সী অনেককেই চলে যেতে দেখেছেন না-ফেরার দেশে। আপনার ভাই, আত্মীয়, প্রিয় ব্যক্তিদের অনেকের কবরই আজ পুরোনো হয়ে গেছে। হায়, তবুও কি আপনার চিন্তা জাগে না, আজ বাদে কাল আপনিও তাদের শিবিরে নাম লেখাতে যাচ্ছেন? এতকিছু সত্ত্বেও কি আপনার বোধ জাগে না কেউ সতর্ক করে দিলে?

বড়েই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক এটি। যার জ্ঞান আছে, যার বুদ্ধি আছে, সে কী করে এমন অবহেলায় জীবন নষ্ট করতে পারে?

লিখছিলাম ইমাম ইবনুল জাওযি رحمته الله-এর দরদ-মাখা কিছু নাসীহা। উম্মতের প্রতি দরদী এই পিতা কত বাস্তব কথাই-না বলেছেন তাঁর সাইদুল খাতির গ্রন্থে! তবে দেহের সুস্থতা যোভাবে মানুষকে ধোঁকায় ফেলে রাখে, তেমনি মনের ঈমানের হালতও ব্যক্তিকে ধোঁকায় ফেলে দেয়। ব্যক্তি ভাবতে থাকে, যে স্বচ্ছ ঈমান নিয়ে সে পৃথিবীতে জন্মেছে, সেই একই

ঈমান নিয়ে সে পরকালে পাড়ি জমাবে। তবে দেহের অসুস্থতার বিষয়টি দৃশ্যমান হওয়ায় তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য ব্যক্তি সচেতন হলেও মনের অসুস্থতার বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ অবচেতন।

আর তাই সংশয়ের এই যুগে অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে আমাদের ঈমানের পরিচর্যা বড্ড বেশি প্রয়োজন। পরিবর্তনশীল এই যুগে অন্তরের ওপর সদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখলে পদস্বলন অবশ্যসম্ভাবী। অনেকে বলে, আত্মার পরিচর্যা নিয়ে বাজারে এত বই থাকতে কী দরকার একই বিষয়ে আবার লেখার? কিন্তু অন্তর বলে, আমি পরিবর্তনশীল। তাই তো আমার নাম কলব, যার কাজ সদা তাকাব্লুব করা। অর্থাৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলাই আমার বৈশিষ্ট্য। কাজেই আমার প্রতি ক্ষণিকের অসতর্কতা তোমার বিপদ বয়ে আনবে।

আসলে আমাদের অন্তর-জমিনে-থাকা এই ঈমান অনেকটা পাখির পালকের মতো। ধু-ধু মরুতে সে উড়ে চলেছে। কখনও মুমিনদের শিবিরে, কখনও পাপীদের শিবিরে। কখনও ঈমানের শীতল হওয়ায় সে উড়ে যায় রবের আসমানে, কখনও পাপের ঝাঁপটায় আছড়ে পড়ে জমিনে। সকল তারীফ আল্লাহর, যিনি পাপের দরুন তাৎক্ষণিক আমাদের নাম কাফেরদের তালিকায় তুলে দেন না। রহমতের ছায়া থেকে কোনো তাওবাকারীকেই তিনি বঞ্চিত করেন না। সেই সাথে দরুদ ও সালাম পেশ করছি প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর। যিনি এসেছিলেন এই ধরণিতে মুমিনদের হৃদয়-কুটিরকে আলোকিত করতে। সংশয় আর অবিশ্বাসের মরিচা-ধরা হৃদয়-প্রাচীরকে ঈমানের ছাঁচে ঢেলে সাজবার জন্যে।

উস্তাদ আলি হাম্মুদা হাফিয়াছল্লাহ-কে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। শিহাব ভাইয়ের অনুদিত ‘হারিয়ে যাওয়া মুক্তো’র মাধ্যমে ইতিপূর্বে পাঠকদের নিকট পৌঁছে গেছেন তিনি। ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত এই আলিমের খ্যাতি জগৎজুড়ে। তবে লেখক হিসেবে যতটা না বিখ্যাত, তার চেয়ে বক্তা হিসেবে তিনি সুপরিচিত।

প্রত্যেক দাঈ ইল্লাল্লাহর একটি নির্দিষ্ট আঙিনা থাকে। যে আঙিনাকে তিনি উর্বর করেন, বীজ বপন করেন, যত্ন নেয় আর সঁচের মাধ্যমে তাদের বড়ো করে করে তুলেন। আগাছা পরিষ্কার করা, পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা—সার্বিক কাজ করেন তিনি। পরিশ্রম আর ধৈর্যের সহবস্থানে দাঁড়িয়ে উম্মতকে একটি উৎকৃষ্ট ফলন উপহার দেন। তাই একজন দাঈ-মাত্রই একজন কৃষক। উস্তাদ আলি হাম্মুদার আঙিনা হলো যুবসমাজ। যুবাদের অন্তরই তার খামার। অন্তরের শুদ্ধি নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ-করে-চলা এই মানুষটির সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ২০১৮ সালে। কর্মসূত্রে এক ভাইয়ের মাধ্যমে তাঁর নাম জানতে পারি। সে থেকে অনলাইনে থাকা তার প্রাঞ্জল বক্তৃতাসমূহ শুনতে

শুনতে কখন যে সব শোনা হয়ে গেল, নিজেও টের পাইনি।

অধিকাংশ পশ্চিমা দাঈ-র একটি অপ্রকাশিত বাস্তবতা হচ্ছে, সেখানে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামকে উপস্থাপন করা। ইসলামের যে-সকল বিষয়গুলো সমাজে প্রশংসিত, সেগুলো উল্লেখ করা, আর যেগুলো প্রকাশ করলে রাঢ় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়, সেই হক কথাগুলো এড়িয়ে চলেন তারা। ক্ষেত্রবিশেষ মনস্তাত্ত্বিক এই যুদ্ধে অনেকে পরাজয় মেনে নেন। তখন মুসলিম লেবাসে, আলিমদের পোশাকেই এক নব্য-ইসলামের-প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তারা। সেখানে হয়তো আকীদার তত্ত্ব কথা থাকে, কিন্তু প্রায়োগিক আলোচনা থাকে না। সেখানে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার আহ্বান করা হবে, কিন্তু আল্লাহর জন্য ঘৃণার আকীদা কেউ শেখাবে না। তাই প্রাঞ্জল ভাষা আর আবেগঝরা বক্তৃতায় অনেকে মুগ্ধ হয়ে যান। দীন নিয়ে হালকা পড়াশোনা থাকলেও যুক্তির মারপ্যাঁচে শ্রোতাদের অনেকে এই সত্যটা উপলব্ধি করতে পারে না। তারা ভুলে যান, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ, পরিবেশ, পরিস্থিতি দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। আকীদা বিশ্বাস নিয়ে অধিকাংশের বুঝ নড়বড়ে হওয়ায় বুঝতে পারেন না কোথায় ভুল হচ্ছে। এ জন্য আমাদের ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি رحمته বলেছেন, ‘প্রকৃত অবিচলতা হলো একত্ববাদের ওপর অন্তরের অবিচলতা।’

শুদ্ধির যাত্রা শুরু হবে তাওহীদের শিক্ষা দিয়েই, আল্লাহকে চেনার মধ্য দিয়ে। যে আল্লাহকে যথাযথ চেনে না, তাকে যিকর আর আমলের বাহ্যর শুদ্ধ করতে পারবে না। সে মুসলিমদের লেবাস পড়বে, কিন্তু হারাম লেনদেনকে হালাল জ্ঞান করবে। মাসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়বে, কিন্তু জালিমদের জয়গান গাইবে। তাই তো আমাদের পূর্ববর্তীগণ পাপের কারণ হিসেবে বলতেন, ‘লোকটি আল্লাহকে যথাযথ সম্মান করেনি, তাই সে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে।’

উস্তাদ আলি হাম্মুদার এ-যাবৎ যত লেকচার দেখেছি, তিনি ব্যতিক্রম। শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের চেয়ে তাদের শুদ্ধির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। বক্ষ্যমাণ বইটি উস্তাদ আলি হাম্মুদার লেকচার সংকলন। এ ছাড়া তাঁর ব্লগে, ফেইসবুকে উন্মত্তের উদ্দেশ্যে উপকারী যে উপদেশমালা ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমি সেগুলোও বাছাই করে নিয়ে এসেছি এখানে। অনুবাদ নয়, বরং ছায়া অবলম্বনে রচনা করেছি ‘কলবুন সালীম : নির্মল অন্তর, নির্মল জীবন’ গ্রন্থটি।

শ্রদ্ধেয় জুবায়ের ভাইয়ের সম্পাদনায় লেখাগুলো আরও পরিপূর্ণতা পেয়েছে আলহামদু লিল্লাহ। এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার মতো অধর্মের লেখা সংশোধন করে দিয়েছেন— এজন্য আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। সেই সাথে প্রকাশক, পাঠকদের ভিতর যারাই আমাদের

লেখার পেছনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, আল্লাহ যেন এর প্রতিদান তাদের আমলনামায় যুক্ত করে দেন।

পরিশেষে নিজেকে বলব, প্রত্যেকটি বইয়ের সাথে লেখকের দায়বদ্ধতা থাকে। এই দায়বদ্ধতা যতটা না পাঠকের সমীপে, তার চেয়ে লেখকের নিজের। এই দায়বদ্ধতা আমলের, এই দায়বদ্ধতা দাওয়াতের। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষর এই আবদার নিয়েই লেখকের কলমে জন্মায়। আল্লাহই এই তাওফীক দেন, যেন বান্দা এ দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি তালাশ করতে পারে। আর যে এই কলমের অপব্যবহার করে, তাকে তার কলমই ধ্বংস করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া رحمہ اللہ বলেন, ‘যে বান্দা যত বেশি রবের নিয়ামাতরাজিতে ডুবে থাকে, সে তত বেশি কৃতজ্ঞতা আদায় ও তাওবা ইস্তিগফারের মুখাপেক্ষী হয়।’

তাই এই বই প্রকাশ আমার জন্য যতটা সুখকর, তার চেয়ে শঙ্কার। হুজ্জাত কায়েম হয়ে গেছে, সময় এখন হক আদায়ের। আর এর হক তখনই আদায় হবে, যখন এর প্রতিটি পাতা আমার অভ্যাসে পরিণত হবে। তাই বইটি শুধু পাঠকদের জন্যই নয়, আমার জন্যও। এতে স্থান-পাওয়া প্রতিটি নসিহত সবার আগে আমি নিজেকে দেব। এরপর পাঠক এতে ভালো যা কিছু পাবে, তার জন্য আল্লাহরই শোকর। তিনি যাকে ইচ্ছা, তাকে রহমতের চাদরে ঢেকে দেন। লেখকের কলম এখানে মাধ্যম মাত্র।

আমি ভুলের উর্ধে নই। আত্মশুদ্ধির বাইরেও নই। বইটি আপনাদের আগে আমার নিজের জন্যই লেখা। তাই আপনার যত ভালো লাগা, মন্দ লাগা, এই অধমের প্রতি যত নসিহত আছে জানাতে কার্ণ্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে। আল্লাহ্ মুসতাআন।

মহিউদ্দিন রূপম

mohiuddinrupom1415@gmail.com

০৫/৬/২০২০ ইং

## সফল্যের ঐগিঠ-ঐগিঠ

বছর কয়েক আগের কথা। অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবস মারা গেলেন। এমন কেউই হয়তো নেই, যে কিনা জবসের মৃত্যুসংবাদ শোনেনি। প্রায় একই সময়ে উম্মতে মুহাম্মাদী এমন একজনকে হারিয়েছে, যাঁকে একদিক থেকে একুশ শতকের কিংবদন্তীর খেতাব দেওয়া যায়। মিডিয়া-জুড়ে যখন স্টিভ জবসের মৃত্যুর খবর প্রচারিত হচ্ছে, সেই সময় এই মানুষটি চলে যান। কিন্তু তাঁর ইস্তেকালের খবর খুব কম লোকই জানতে পারে।

আজ আপনাদেরকে এমনই এক ব্যক্তির গল্প শোনাব। দুনিয়ার জীবনে তিনি হয়তো যোগ্য আসন পাননি। কিন্তু আমরা আশাবাদী—ওপারে ঠিকই পেয়ে গেছেন, বিইজনিম্মাহ।

বলছি ডা. আবদুর রহমান সুমাইত ﷺ-এর কথা। তিনি কুয়েতের একজন ডাক্তার; মেডিসিন এবং সার্জারি-বিশেষজ্ঞ ছিলেন। পড়াশোনা করেছেন বাগদাদ ইউনিভার্সিটি থেকে। আট-দশ জন ছাত্রের মতো তিনিও স্নাতক সমাপ্ত করেন। এরপর পাড়ি জমান ইংল্যান্ডে। University of Liverpool থেকে Tropical diseases এর ওপর ডিপ্লোমা কোর্স করেন ১৯৭৪ সালে। এরপর স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করেন কানাডার McGill University of Montreal বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এই ধাপে তিনি internal diseases এবং gastro enterology the digestive system এর ওপর বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন।

এগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো, আমার-আপনার মতোই খেটে-খাওয়া-মানুষ ছিলেন ডা. আবদুর রহমান সুমাইত। বিয়ে করেছিলেন এক নারীকে, যার ডাক-নাম উম্মু সুহাইব। অর্থাৎ সুহাইবের মা। ডা. সুমাইত ছিলেন ‘আবু সুহাইব’, আর তাঁর স্ত্রী উম্মু সুহাইব। সুখের সংসার ছিল তাঁদের।

উম্মু সুহাইব ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার মহিলা। একদিন তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন, ‘সুহাইবের বাবা, একটা কথা। আমি চাই না আট-দশজন লোকের মতো শ্রেফ খেয়েপরেই আমাদের জীবনটা কেটে যাক। এর চেয়েও মহৎ কোনো উদ্দেশ্যে আমাদের

সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই আমাদের আরও বড়ো কিছু করতে হবে।' স্বামী জানতে চাইলেন, 'প্রিয়তমা, তুমি কী ভাবছ? আমাকে বলো।' স্বামীর বিস্ময় ভেঙে দিয়ে স্ত্রী বললেন, 'আমি মনে করি, আমাদের উচিত মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, দাওয়াহ দেওয়া। আপনি কী বলেন?' আবু সুহাইব বললেন, 'আমিও তাই মনে করি, আমাদের আসলেই উচিত মানুষদের আল্লাহর পথে আহ্বান করা।' স্বামীকে রাজি হতে দেখে স্ত্রী ভীষণ খুশি—'চমৎকার! তা হলে চলুন, আমরা পূর্ব-এশিয়ায় যাই আর সেখানে আমাদের বাকিটা জীবন উজাড় করে দিই! আমি শিক্ষকতার পাশাপাশি দাওয়াহ দিলাম। আর আপনি ডাক্তারি পেশা চালিয়ে গেলেন, সাথে সাথে দাওয়ার কাজও করলেন। আল্লাহ যদি আমাদের মধ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখতে পান, তা হলেই আমরা সফল।' আল্লাহ বলেন,

إِنْ يَعْزِمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ

'যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালো কিছু দেখেন, তা হলে তোমাদের থেকে যা নেওয়া হয়েছে তা থেকে তিনি অনেক বেশি দেবেন।'<sup>[১]</sup>

এ সময় কুয়েতের প্রাক্তন অমীর জাবির-এর স্ত্রী ডা. সুমাইতকে ডেকে পাঠান। তিনি ডা. সুমাইতকে বলেন, 'আমার জমানো কিছু টাকা আছে। ওগুলো আপনাকে দিতে চাই। এই টাকা নিয়ে আপনি আফ্রিকায় যাবেন। আর আমার নামে একটা মাসজিদ করবেন। আমি চাই মাসজিদের নির্মাণকাজ আপনি নিজেই তদারকি করবেন।' তিনি সেই অর্থ গ্রহণ করে বিদায় নেন। এরপর মাসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে চলে যান আফ্রিকায়।

আফ্রিকা মহাদেশের এক শহরে অবতরণ করেন তিনি। এরপর শুরু করেন মাসজিদ নির্মাণকাজ। কাজের ফাঁকে আফ্রিকার কিছু গ্রামও হেঁটে হেঁটে দেখতে থাকেন। এসময় তিনি যা দেখলেন, তাতে প্রচণ্ড বিস্ময়, হতাশা ও আতঙ্ক অনুভব করলেন। এককাল বইপুস্তকে যা পড়েছেন সব যেন চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছেন। তিনি এমন মুসলিমদের দেখা পান, যারা জানে না কীভাবে সূরা ফাতিহা পড়তে হয়। এমন মুসলিমও আছে, যারা জানে না ইসলামের আরকান কী কী, জানে না সালাত কীভাবে পড়তে হয়; সাওম-হাজ্জ-যাকাতের কথা বাদই দিলাম। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো একদমই ভুলে গেছে তারা।

ডা. আবদুর রহমান বলেন, 'শুধু তাই নয়, দেখলাম মাসজিদের ইমামগণ মাসজিদের ভিতরে যিনায় লিপ্ত। তারা জানেই না এগুলো হারাম। সাথে আছে অমুসলিমরাও।' এ ছাড়া আরও যা কিছু দেখলেন, সবই ছিল খারাপির শীর্ষে। শিরক আর পৌত্তলিকতায়

[১] সূরা আনফাল, ৮ : ৭০



হেয়ে গেছে গোটা সমাজ। দেখলেন, মানুষজন চাঁদ তারার পূজা করছে। সাজদা দিচ্ছে গাছকে, সেই সাথে একে অপরকেও। শ্রম্ভার ধারণা তাদের অন্তর থেকে যেন সমূলে উঠে গেছে। খ্রিস্টান মিশনারিরাও এসেছে আফ্রিকায়। তাদের দাওয়াত পেয়ে টাকার লোভে গ্রামের লোকজন ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হতে শুরু করল। তারা আপন ধর্ম ছেড়ে দিচ্ছে কেবল খাদ্য পানির অভাবে, থাকার কোনো জায়গা না পেয়ে। তানযানিয়া, মালাবি, মাদাগাস্কার, দক্ষিণ সুদান, নাইগার ইত্যাদি জায়গায় তিনি এসবের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে এলেন।

এসব দেখার পর ডা. সুমাইত মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়লেন। যেন আত্মযন্ত্রণায় তার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে উন্মত্তের এই করুণ দশা দেখে। দেশে ফিরে আর দেরি করলেন না। উম্মু সুহাইবকে খুলে বললেন কষ্টের কথাগুলো। কাতর-কণ্ঠে বললেন, ‘আমাদের অবশ্যই এসব নিয়ে কিছু করা উচিত।’ স্ত্রী বললেন, ‘আমরা কী করতে পারি?’

হ্যাঁ, সেদিন থেকেই ডা. সুমাইত আফ্রিকার মানুষগুলোর হিদায়াতের জন্য উৎসর্গ করে চললেন তাঁর জীবন, সময়, শ্রম, অশ্রু, সম্পদ—সবকিছু। সমস্ত-কিছু আল্লাহর জন্য, আল্লাহর পথে দাওয়াতের জন্য ঢেলে দিয়েছেন উন্মত্তের এই দরদী পিতা। মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পেতে নয়, এসব তিনি একাই করেছেন নিজ পরিবারকে সাথে নিয়ে। এভাবেই আফ্রিকায় শুরু হয় তাঁর জীবনের নতুন একটি অধ্যায়। ড. আবদুর রহমান সুমাইত ﷺ-এর অভিজ্ঞতার কিছু অংশ আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি :

ড. মুসা শারিফ হাফিয়াহুল্লাহ পরিচালিত একটি ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ড. আবদুর রহমান। সেই অনুষ্ঠানে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে এমন কিছু কথা বলেন, যা আমাদের চিন্তার বাহিরে। তিনি বলেন, ‘কিছু গ্রামে আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়াটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই গ্রাম এবং আমাদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এক বিশাল নদী। বন্ধ নদী হলেও এতে পানি ছিল বেশ। কিন্তু ময়লা, আবর্জনা এত টাইটসুর যে, পানি একদম কালো হয়ে গেছে। সব রকমের রোগ-বাল্যই আর পোকামাকড়ের আস্তানায় পরিণত হয়েছে। হেঁটে হেঁটে এই নদী পার হওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তাও ছিল না আমাদের সামনে।’

তিনি বলেন, ‘আমরা নদীতে নামি। ধীরে ধীরে এর পানিও আমাদের গলা পর্যন্ত উঠে আসে।’ উপস্থাপক প্রশ্ন করেন, ‘নদীর ওপারে পৌঁছোতে এভাবে কতক্ষণ হাঁটতে হয়েছিল?’ শাইখ বলেন, ‘দুই থেকে চার ঘণ্টা।’

প্রিয় পাঠক, ভেবে দেখুন। তিনি একজন ডাক্তার! tropical diseases এর ওপর তার ডিগ্রি রয়েছে! খুব ভালোকরেই জানেন, বিষাক্ত পানিতে এতক্ষণ থাকা কতটা

বিপজ্জনক।

ড. আবদুর রহমান বলেন, ‘আফ্রিকার কাঁচাপথ মাড়িয়ে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে কখনও কখনও ২০০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার হাঁটতে হয়েছে আমাদের। আবার এমনও হয়েছে, তিনদিন পেরিয়ে গেছে কিন্তু খাওয়ার মতো কিছু পাইনি। মনে পড়ে একবার আমি হাঁটু গেড়ে বসেছিলাম দুর্গন্ধ আর আবর্জনায ভর্তি একটা পুকুরের ধারে। হাত দিয়ে গর্ত করছিলাম এই আশায়, যদি গলা ভেজানোর মতো একটু পরিষ্কার পানি পাই...

সতাই, দাওয়াতের পথ মোটেও মসৃণ নয়। কেনিয়া, মজাম্বিক এবং মালাবিতে ড. আবদুর রহমান কমপক্ষে তিনবার ভয়ঙ্কর বিষধর গোখরা সাপের ছোবলে পড়তে নিয়েছিলেন। প্রতিবার আল্লাহ তাঁকে অলৌকিকভাবে বাঁচিয়ে দেন। এ ছাড়া দুই-দুইবার তাঁকে গুপ্ত হত্যার চেষ্টা করা হয়, দুবার কারাবরণ করতে হয়, এবং মৃত্যুদণ্ডের শঙ্কা পর্যন্ত তৈরি হয়।

ডা. আবদুর রহমান ইন্টারভিউতে জানান, আফ্রিকা থেকে তিনি কী পরিমাণ রোগ-বালাই নিয়ে ফিরেছিলেন। প্রায়ই এমন গ্রামে যেতে দরকার হতো, যেখানে যেতে তিনি ট্রাকের পিছনে চেপে বসতেন। কিন্তু রাস্তা কাঁচা হওয়ায় ট্রাকের একপাশ থেকে আরেকপাশে ক্রমেই গড়িয়ে পড়েছেন। এভাবে ধাক্কা খেতে খেতে গেছেন পুরোটা পথ!

কেন? কেন তিনি এতটা কষ্ট স্বীকার করছিলেন? কারণ, তিনি আল্লাহর কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সস্তা মূল্যের বিনিময়ে নয়, বরং রাজাধিরাজ আল্লাহর জন্য নিজেকে বিক্রি করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা এই শ্রেণীর মানুষদের ব্যাপারে বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٦١﴾

‘আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেকে সঁপে দেয়। আর আল্লাহ (তাঁর) বান্দাদের প্রতি মেহশীল।’<sup>[২]</sup>

সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه চমৎকার কিছু কথা বলেছেন বিলাল رضي الله عنه সম্পর্কে— বিলাল ইসলামের জন্য বুকো পাথরের চাপা সহ্য করেছেন। ওপরে কয়লার মতো গরম পাথর, আর নিচে তপ্ত বালু, এভাবে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা শুয়ে থাকতে হয়েছে তাঁকে মরুভূমিতে। সেই নির্ধাতনের কথা স্মরণ করে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه বলেন,

إِلَّا بِرَأْيِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ

“..বিলাল হলো সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে আল্লাহর জন্য সঁপে দিয়েছিল।”<sup>[৩]</sup>

ড. আবদুর রহমান বলেন, ‘একবার আমরা একটা গ্রামে যাই। সেখানে তখন তীব্র খরা চলছিল। চারিদিকে পানির জন্য হাহাকার। এই সময়ে আমরা উপস্থিত। কিন্তু গ্রামের সরদার আমাদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিল না। আমরা তাকে খুব করে অনুরোধ করলাম। সে বলল, ‘ঠিক আছে ঢুকতে দেব; তবে এক শর্তে, যদি তোমাদের শ্রষ্টাকে বলে আমাদের গ্রামে বৃষ্টি বর্ষণ করাতে পারো, তা হলো’ ড. আবদুর রহমান বললেন, ‘দয়া করে আমাদের এমন শর্ত দেবেন না। বৃষ্টি হওয়াটা আমার-আপনার কারোর হাতেই নেই।’

সরদার বলল, ‘ঠিক আছে, তা হলে তোমরা চলে যাও’। শাইখ বলেন, ‘আমাদেরকে একটি সুযোগ দিন প্লিজ!’ কিন্তু গ্রামের সরদার নাছোড়বান্দা, ‘তোমাদের শ্রষ্টাকে বলে বৃষ্টি বর্ষণ করতো’ শাইখ আবারও বললেন, ‘বৃষ্টি হওয়া-না হওয়া আমার সামর্থ্যে নেই।’ কিন্তু সরদার আপন সিদ্ধান্তে অনড়। ডা. আবদুর রহমান বলেন, ‘সে আমাদেরকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিল। এই দিকে আমার অন্তরে যে কী পরিমাণ কষ্ট অনুভূত হচ্ছিল, তা শুধু আল্লাহই জানেন। আমার সাথীদের দিকে তাকালাম, তারা আমার দিকে চেয়ে আছে। কী করব আমরা? কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না।’

এরপর তিনি বলেন, ‘আমি আল্লাহর কাছে হাত পাতলাম। ভিক্ষা চাইতে থাকলাম এবং মন থেকে ডাকতে থাকলাম। প্রচুর পরিমাণে কাঁদলাম এই বলে, ‘রব আমার! আমার পাপের কারণে আপনার বান্দাদের ঈমান থেকে বঞ্চিত করবেন না।’ আমি কাঁদতে কাঁদতে আকাশের দিকে তাকালাম, লক্ষ করলাম—হঠাৎ মেঘ জমা হতে শুরু করেছে। ক্রমেই আকাশ কালো হয়ে এলো। বজ্রপাত শুরু হলো, সেই সাথে ঝড়ো বাতাস। এরপর আকাশ ফেটে অঝোরে বৃষ্টি বর্ষণ হলো সেদিন। আল্লাহ্ আকবার!’

আফ্রিকার এই লোকগুলো জীবনেও এরকম বিস্ময়কর কিছু ঘটতে দেখেনি। তারাও হতবিহ্বল হলো। সদরদারসহ পুরো গ্রামবাসী ইসলামে প্রবেশ করল।

ড. আবদুর রহমান সুমাইত-এর এক আদুরে নাতনী ছিল। কুয়েতে পড়াশোনায় বেশ নাম কামিয়েছিল সে। তো নানাভাষা তাঁর নাতনীকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। পুরস্কারটা কিন্তু সিনেমার টিকেট, ভাউচার, কিংবা খেলনা পুতুল ছিল না। সেটি ছিল আফ্রিকার টিকেট। তিনি তাকে আফ্রিকায় আসার আমন্ত্রণ জানান। বলেন, ‘এখানে আসো! আমার সাথে কিছু সময় দাও দাওয়াতি কাজে। এটাই তোমার পুরস্কার।’ তেরো বছর বয়সী এই বালিকা আপন ভূমি ছেড়ে চলে আসে সুদূর আফ্রিকায়। গিয়ে তার আত্মীয়দের সাথে

[৩] ইবনু মাজহ, ১৫০; আহমাদ, ৩৮২২; সহীহ

সাক্ষাৎ করে। সেখানে সে অবস্থান করে কয়েক সপ্তাহ। ওর ওছিলায় এই অল্প সময়ে ২৭ জন ব্যক্তি শাহাদাত পাঠ করে, আলহামদু লিল্লাহ। দেখুন শাইখের আদর্শ! তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তার পরবর্তী প্রজন্মকেও ঈমানের আলোয় আলোকিত করে গেছেন। ইয়া সালাম!

ড. আবদুর রহমান বলেন, ‘আমি সেই মুহূর্তটা কখনও ভুলতে পারব না, যেদিন আমি এবং আমার স্ত্রী উম্মু সুহাইব মাদাগাস্কারের একটি ছোট্ট কুটিরে ছিলাম। মধ্য রাতে আমরা একসাথে বসে আছি বাড়ির আঙিনায়। আমি তার চেহারার দিকে তাকাই। চেহারাজুড়ে অবসাদ আর ক্লান্তির ছাপ। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম।’

‘উম্মু সুহাইব, অনেক ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। তুমি কি হাল ছেড়ে দিয়েছ?’

‘আবু সুহাইব, আমি আপনাকে বলব এইমাত্র আমি কী ভাবছিলাম?’

‘হুম, বলো।’

‘আমি ভাবছিলাম, আল্লাহ যদি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেন, আমরা কি সেদিন ঠিক এই পরিমাণ সুখী হতে পারব যতটা সুখ আজ অনুভব করছি?’

কথায় আছে, প্রত্যেক সফল ব্যক্তির পেছনেই একজন নারী থাকে...

দেখতে দেখতে ড. আবদুর রহমান সুমাহিত জীবনের তিরিশটি বছর টেলে দিলেন আফ্রিকা মহাদেশে। দ্বীনের রাহে ব্যয় করলেন সামর্থ্যের সবটুকু। আল্লাহর শপথ, তার অর্জন এতটা বিস্ময়কর ছিল যে, বিলিয়ন বাজেট নির্ধারণকারী জাতিও তা অর্জন করতে পারেনি। দাওয়াতি কার্যক্রমের তিরিশ বছরে আবদুর রহমানের ফিরিস্তি ছিল বিশাল। তিনি ৫৫০০ মাসজিদ নির্মাণ করেছেন, ৫০,০০০ ইয়াতিমের ভরণপোষণ দিয়েছেন, যাদের অনেকেই এখন ডাক্তার এবং আইনজীবী। ড. আবদুর রহমান বিতরণ করেছেন প্রায় ৭০ লক্ষ কুরআন। প্রতিষ্ঠা করেছেন ৮৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছোট্টদের নার্সারি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়, যা আজ আফ্রিকার ৫ লক্ষেরও অধিক ছাত্রের আবাস। ড. আবদুর রহমান নিজে খনন করেছেন এবং খনন করিয়েছেন এমন টিউব ওয়েলের সংখ্যা ১২০০০ এর কম নয়, এবং নির্মাণ করেছেন ৯০টি হাসপাতাল এবং ফার্মেসি।

আর কত লোক তাঁর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছে, সেই সংখ্যা কেবল আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তবে তাঁর সঙ্গীদের অনুমান, শাহাদাত পাঠকারীদের সংখ্যা অন্তত এক কোটি!

এত বড়ো বড়ো অর্জন, এগুলোর কোনোটাই সহজ ছিল না। এজন্য তাঁকে হারাতে হয়েছে অনেক সঙ্গী-সাথি, নির্ধুম কেটেছে বহু রাত্রি। দুনিয়াবী স্বপ্নকে মাটি করে দিতে

হয়েছে। দিতে হয়েছে শারীরিক শ্রম। শরীরে বাসা বেঁধেছে অসংখ্য রোগব্যাদি। ফলে প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে ২০টি করে ট্যাবলেট খেতে হতো তাঁকে। জীবনের অস্তিম মুহূর্তে এসে ড. আবদুর রহমানকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে দৌড়াতে হয়েছে নিজের চিকিৎসার জন্যে। আরও আগে থেকেই নিজের প্রতি মনোযোগী হওয়া দরকার ছিল, কিন্তু উম্মতের চিন্তায় এই দরদী পিতা ভুলে গেছেন নিজের কথা। এখন মৃত্যু তার দরজায় কড়া নাড়ছে; আফ্রিকা থেকে কুয়েত গেলেন, কুয়েত থেকে জার্মানি। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে। সবশেষে ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে একটি ঘোষণা ভেসে এলো, ড. আবদুর রহমান আর নেই... তিনি ইস্তেকাল করেছেন...

আল্লাহ তাআলা রহম করুক শাইখের ওপর, আমাদের পিতার ওপর। রহিমাছল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাঁর হাশর করুক নবি-রাসূলদের সাথে, শহীদ এবং সিদ্দীকদের সাথে।

পাঠক একটিবার ভেবে দেখুন, একটি ডিগ্রির পেছনে হাজার হাজার টাকা আপনি ইউনিভার্সিটিতে ঢালছেন। এরপর গ্রাজুয়েশনও সমাপ্ত করলেন। কিন্তু চাকরির বাজারে নামতেই আবিষ্কার করলেন, এই ডিগ্রির কোনো মূল্য নেই। তখন আপনার কেমন লাগবে? কল্পনা করুন, যে পরীক্ষার জন্য আপনি ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা, রাতের-পর-রাত জেগে প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে আবিষ্কার করলেন যে, আপনি ভুল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছেন! তখন আপনার কেমন লাগবে? কল্পনা করুন, আপনি কয়েক বছর ধরে একটি সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। উঠছেন-তো-উঠছেন... এভাবে উঠতে উঠতে শেষ ধাপে এসে পেলেন দুর্ভেদ্য একটি দেওয়াল! তখন আপনার কেমন লাগবে?

এই তিনটি উদাহরণের আলোকে সবাই যদি নিজেকে প্রশ্ন করি, আমার উদ্দেশ্য কী? আমার লক্ষ্য কী? আমি কী করছি? যে জিনিসের পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে যাচ্ছি, এর শেষটা যদি হয় এমনই হতাশা এবং আফসোসের, তখন আমি কী করব? ফিরে কি পাব খুঁইয়ে-ফেলা এই সময়? ফিরে পাব সুযোগ? কমাতে কি পারব কলিজা-ফাটা বেদনা আর আফসোস?

মূল সমস্যা দুটি শব্দেই প্রকাশ করা যায়—‘লক্ষ্য নির্ধারণ’। আপনার জীবনের লক্ষ্য কী? একজন মুমিনের স্থানে দাঁড়িয়ে আপনি যখন জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন, কীভাবে বুঝবেন আপনার লক্ষ্য সঠিক? কিংবা আপনার গন্তব্য সঠিক পথে এগোচ্ছে—কীভাবে যাচাই করবেন? কিয়ামাতের দিন আফসোস করা থেকে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন? বুকফাটা আর্তনাদ থেকে কীভাবে বাঁচাবেন নিজেকে?

সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণের মানদণ্ড কী হবে? ব্যক্তির অর্জিত অর্থ-সম্পদের দ্বারা কি নির্ধারণ করা হবে, না যে স্টেটাস এবং সম্মান সে অর্জন করেছে—তা দ্বারা? ইসলামি মানদণ্ড কী?

ধরতে পারছেন সমস্যা কোথায়? বাস্তবে আমরা হয়তো কেউই নিজেদেরকে প্রশ্নগুলো করি না। দুনিয়া অর্জনে আমাদের অস্থিরতা, দুনিয়াকে ঘিরে সাজানো এই জীবন আমাদেরকে ভুলিয়ে দেয়। সত্যি বলতে, ঠিক সেদিনই আমরা সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারব। যেদিন হাশরের ময়দানে একত্র হব, বুঝতে পারব দুনিয়ার জীবন কতটা মূল্যবান ছিল। সেদিন বাস্তবতা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। জীবনের আসল অর্থ-মর্ম ওইদিন বোঝে আসবে। মিলবে চূড়ান্ত প্রতিদান। বুঝতে পারব, কত বড়ো সুযোগ আমরা হেলায় নষ্ট করেছি। কিয়ামাতের দিন, আসল হার-জিতের দিন আমরা সব বুঝতে পারব। খুব দূরে নয় সেদিন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا  
نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٣﴾

‘আর তুমি যদি দেখতে, যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে মাথানত হয়ে থাকবে (তারা বলবে) “আমাদের রব, আমরা দেখেছি ও শুনেছি, কাজেই আমাদেরকে পুনরায় পাঠিয়ে দিন, আমরা সংকর্ম করব। নিশ্চয় আমরা দৃঢ়-বিশ্বাসী।”’<sup>[৪]</sup>

অপরাধীরা বলবে, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ! এখন আমরা শুনতেও পাচ্ছি। কাজেই আমাদেরকে ফিরিয়ে দিন!

সূরা রুফ-এ আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٥﴾

‘এ ব্যাপারে তুমি অস্ত ছিলো। তাই তোমার সামনে যে আবরণ ছিল তা আমি সরিয়ে দিয়েছি। তাই আজ তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর।’<sup>[৫]</sup>

বিচার-দিবসে আল্লাহ তাআলা এক পাপী বান্দাকে বলবেন, তুমি গাফেল ছিলো। এই দিনের অপেক্ষায় ঘুমিয়ে ছিলো। আজ আমি তোমার দৃষ্টির পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, এখন তুমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ। আয়াতে আল্লাহ حَدِيدٌ (হাদীদ) শব্দটি উল্লেখ করেছেন। এর শাব্দিক অর্থ হলো লোহা। অর্থাৎ তোমার দৃষ্টি আজ লোহার মতো তীক্ষ্ণ হবে। এখন তুমি সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ।

[৪] সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১২

[৫] সূরা রুফ, ৫০ : ২২

ভাই-বোনেরা, দুনিয়ার জীবনে আমরা নিজেদের লক্ষ্য নিজেরা নির্ধারণ করতে পারি না। কেননা কোনোকিছুর বাস্তবতা তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। বরং আমাদের কর্মের আসল ফলাফল এখন আমাদের দৃশ্যের বাইরে। কেবল কিয়ামাতের দিনই প্রতিটি কাজের ফলাফল দেখতে পাব। তাই জীবনের লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী, তাঁর বিধান মোতাবেক।

আমরা আবার সেই প্রশ্নে ফিরে যাচ্ছি, সুন্দর লক্ষ্য কী? কিংবা বলতে পারি, সাফল্যের সংজ্ঞা কী? জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের গুরুত্ব আপনাদেরকে, আপনাদের পরিবার, আত্মীয় এবং সন্তানদের বোঝাতে যদি সক্ষম হয়ে থাকি—তা হলে শুনুন, জীবনের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, আল্লাহর কালাম থেকেই শুনুন; কুরআনের তৃতীয় সূরা, সূরা আ ল ইমরানের ১৮৫ আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর অবশ্যই কিয়ামাতের দিন তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে।’

এরপর আল্লাহ তাআলা বলছেন জীবনের লক্ষ্য নিয়ে :

فَسَنُزَجِّعَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَعَدَّ فَازًا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

‘সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন তো শুধু ধোঁকার সামগ্রী।’

সাফল্য এটাই। সাফল্য ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করতে পারা নয়, সাফল্য বড়ো ব্যবসায়ী হওয়া, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির CEO কিংবা সংসদের এমপি হওয়ায় নয়। তেমনি সাফল্য বিয়ে করতে পারা নয়, সন্তানের বাবা-মা হওয়া কিংবা নোবেল প্রাইজ জেতা নয়। বরং দুনিয়ার জীবনের তাবত সফলতা যদি আখিরাতের জীবনে সফলতা বয়ে আনতে না পারে, তা হলে এগুলো সবই ব্যর্থতা, কোনো মূল্য নেই এসবের। এটাই আল্লাহর নির্ধারিত মানদণ্ড। ওপারে এই মানদণ্ডেই আমাদের কর্মের ওজন হবে, ফলাফল ঘোষণা হবে।

হ্যাঁ, আবদুর রহমান সুমাইত رحمه الله-এর জীবন-মরণও ছিল এই মানদণ্ডকে ঘিরে। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট, অর্জনও করেছেন তেমনটাই বিইযনিলাহ।

ভাই আমার, দুজন মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য সর্বদা ইলমের ভিত্তিতে রচিত হয় না। বক্তৃতায় কে উত্তম—এটার ওপর না। এমনকি ঈমান এবং ইখলাসের তারতম্যের

কারণেও নয়। হতে পারে উভয়ই এগুলোতে সমান। একজন আখিরাতে প্রতি অত্যন্ত সচেতন মুসলিম, আর অপরজন পিছিয়ে-পড়া গড়পড়তা মুসলিম—এই দুজনের মধ্যে পার্থক্য কখনও স্রেফ একটি কারণে সূচিত হয়, আর তা হলো ‘লক্ষ্য’। একজনের লক্ষ্য সুস্পষ্ট এবং সেদিকেই খাবিত। আর অপরজনের দিনগুলো নিত্যদিনের মতই, নেই কোনো পরিবর্তন।

স্বাস্থ্যের কথা যদি বলি, আমাদের অধিকাংশের স্বাস্থ্য ভালো। অপরদিকে আবদুর রহমান সুমাইত ﷺ-এর ডায়াবেটিকস ছিল, উচ্চ রক্ত চাপ ছিল, দুই দফা তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং তিনবার রক্ত জমাট বেধে গিয়েছিল। একবার হাটে হয়েছে, আরেকবার মস্তিষ্কে। আর এই সমস্ত বিপদ তাঁর সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

সম্পদের কথা ধরলে, আমাদের অনেকের সম্পদ তাঁর চেয়ে বেশি। যৌবনের মানদণ্ডে আমাদের অধিকাংশই ড. আবদুর রহমানের চেয়ে যুবক। তা হলে পার্থক্য কোথায়?

কবি আল-মুতানাব্বি বলেন,

وَإِذَا كَانَتِ الثُّفُوسُ كِبَارًا — تَعَبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامَ

জীবনের লক্ষ্য যদি বড়ো কিছু হয়,  
শরীর তখন পরিশ্রম প্রিয় হয়।<sup>[৬]</sup>

ভাই-বোনেরা, আপনাদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করছি, একজন গড়পড়তা মুসলিম হবেন না। প্রতিযোগিতার মাঠে পিছিয়ে থাকবেন না। আপনার জন্য সহজ এমন কিছু করুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কীসে দক্ষ? কোন কাজে পারদর্শী? মন থেকে খুঁজে বের করুন। আমি জানি এটা মোটেও সহজ নয়। কেননা এর জন্য নিজের সাথে সৎ হতে হবে, লক্ষ্য পূরণের জন্য এলোমেলো জীবন ছেড়ে আপনাকে শৃঙ্খল জীবন যাপন করতে হবে। আমি জানি এটা কঠিন। কিন্তু আল্লাহর কসম, কাল কিয়ামাতের দিন এটাই আপনাকে সর্বোত্তম ফলাফল এনে দেবে। লক্ষ্য নির্ধারণ করুন, আপনার বয়স যতই হোক। আপনি পুরুষ কিংবা নারী যা-ই হোন।

আবারও বলছি, নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনার জীবনের লক্ষ্য কী? আগামী দশ বছরে আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান? যদি ইঙ্গিত পেতে চান দশ বছর পর আপনি কী হবেন, তা হলে নিজেকে প্রশ্ন করুন, দশ বছর আগে আমি কেমন ছিলাম? দশ বছর আগের আপনি আর আজকের আপনার মধ্যে যদি তেমন কোনো পার্থক্য না পান, তা

[৬] দিওয়ানুল মুতানাব্বি, ২/২৪৫



হলে খুব সম্ভব দশ বছর পরেও আপনি এমনই থাকবেন।

লক্ষ্য নির্ধারণ করুন, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার অধিকারী আলিমদের স্মরণাপন্ন হন। তাদের কাছ থেকে জেনে নিন, আমার লক্ষ্য ঠিক আছে কি না। বলুন, আমার ছন্নছাড়া লক্ষ্যকে সাজিয়ে দিন, সময়সীমা নির্ধারণ করে দিন, সাফল্যের সূত্র শিখিয়ে দিন, চোরাবালি চিনিয়ে দিন। এরপর দেখুন আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য সাফল্যের দুয়ার ঠিক সেভাবেই উন্মোচন করে দিচ্ছেন, যেভাবে দিয়েছেন ড. আবদুর রহমান সুমাইত رحمته-এর জন্য।

التَّفْسُ تُبْكِي عَلَى الدُّنْيَا وَقَدْ عَلِمْتَ—إِنَّ السَّلَامَةَ فِيهَا تَرَكُّ مَا فِيهَا

لَا دَارَ لِلْمَرَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَسْكُنُهَا—إِلَّا الَّتِي كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ بَانِيهَا

فَإِنْ بَنَاهَا بِحَيْرٍ طَابَ مَسْكُنُهَا—وَإِنْ بَنَاهَا بِثَرٍّ خَابَ بَانِيهَا

‘নফস কাঁদে দুনিয়ার জন্যে, যদিও সে ভালো করেই জানে

নিরাপদ তো সে, যে এখানে দুনিয়াবিমুখ থাকে।

মৃত্যুর পর আপনঘর হবে সেটাই, যা বানানো হয় মরণের আগে।

যদি নেক আমল দ্বারা তা বানানো হয়, তো (কবর) হবে সুখের বিছানা।

আর যদি বদ আমল দ্বারা তা বানানো হয়, তবে সে ব্যর্থ হবে।’<sup>[৭]</sup>

[আলি ইবনু আবি তালিব رحمته]

## সংশয়মুক্ত ঈমাত

মানুষের অন্তর সদা পরিবর্তনশীল। মুহূর্তে মুহূর্তে তা বদলায়। বদলানোই তার ধর্ম। মানব-হৃদয়ের এই অস্থিরতা চিরন্তন। সকালে যে ব্যক্তি মুসলিম, সন্ধ্যা গড়াতেই সে হয়তো কাফির। একদিন সকালে উঠে আপনি হয়তো ঈমানি জযবা অনুভব করলেন। অথচ ঘণ্টা কয়েক যেতেই দেখলেন, সেই আবেগ হারিয়ে গেছে। অন্তর কঠিন হয়ে গেছে।

মানুষের মন বড়োই জটিল প্রকৃতির। সম্ভবত এ জন্যই এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘কলব’। সর্বদা সে ‘তাকাল্লুব’ অর্থাৎ পরিবর্তন হতে থাকে। প্রতিটা মুহূর্তেই সে রূপ পাল্টায়।

কবি বলেন,

وَمَا سَعَى الْإِنْسَانُ إِلَّا لِنُفْسِهِ  
وَلَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَّقَلَّبُ

মানুষ ভুলোমনা, তাই তো সে ইনসানা।’

অন্তর পরিবর্তনশীল, তাই তো এর নাম কলবা।<sup>[১]</sup>

আমাদের নবিজি ﷺ আরও চমৎকার উপমা দিয়েছেন অন্তরের পরিবর্তন নিয়ে।

আবু মূসা আশআরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ تَقْلِبُهَا الرِّيحُ بِفَلَاةٍ

‘কলব (পাখির) পালকের মতো, ধু-ধু মরুতে বাতাস যাকে দিগ্বিদিক নিয়ে চলে।’<sup>[২]</sup>

[১] আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, ৬৬

[২] ইবনু মাজাহ : ৮৮; আল-জামিউ আস-সগীর : ১/১০৭৮; সহীহ